সংবাদ

তারিখ ... 20 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮

সদস্যরা জীবন করে বের করেছে কেন কখনো ছাড়া পড়তে পারেনি, যারা কন্যাশিশুর শিক্ষার প্রতি অন্যের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক গুরুত্ব হয়েছে। এর প্রমাণ মিলেছে এই ঘটনায়, যাই হয় পরিবারে আগে সবসময়ই বলাবলিতে হতো, তা এখন বন্ধ হয়েছে। তাদের অভিভাবকরা এখন ছাত্র কল্যাণ সমিতির সদস্যদের এসে বলছে, তারা তাদের মেয়েকে আরও পড়াতে চায়।

ছাত্র কল্যাণ সমিতির সদস্যরাই শিক্ষক, যাদের অধিকাংশই নারী (ছাত্রী)। এরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করে কে কোন কোন দিন কতক্ষণ করে পড়াবে। নারী সদস্যদের মধ্যে অনেকেই এভাবে পড়ানোর বাইরেও ছাত্রছাত্রীর বিশেষ করে ছাত্রীদের বাড়িতে যায় এবং তাদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে। বাড়িতে যায় বাবা-মাদের এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে যে, শিক্ষিত না হওয়ার অর্থ হলো জীবনে অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে দূরে থাকা। আর একটি কারণে এটা করা হয় তা হলো অনেক বাবা-মা ছেলে সন্তানদের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে পড়াশোনা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো কাজে লাগানো সংসারে আয় হবে, পড়াশোনা করে তো আর পেট ভরবে না। সদস্যরা জানায়, এভাবে বাড়িতে বাড়িতে যাবার ফলে আগে যেসব শিশু এই কারণে ঝরে পড়ত, তাদের ঝরে পড়া বেশ কমতে শুরু করেছে। তারা আশা করে ২০০৭-এর মধ্যে তা শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকবে। একটি উদাহরণ দেয়া যায়।

অন্যের বাড়িতে কাজ করে যে আয় দিয়ে সংসার চালানো হাসিনা বেগমের ছেলে হাসেম আলী ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে এখন জেলাশহর শহরে একটি আড়তে হিসাবরক্ষকের কাজ নিয়েছে। দুপুরে খাওয়াসহ মাসে তার বেতন ৭০০ টাকা। হাসিনা বেগম জানান, দুইটি আশার হাসেম আর আমাকে বাঁচাইছে। বলিও দুইটিরা হাসিনা বেগমকে একেবারে 'বাঁচানোতে' মোটেই খুশি নয়, তাদের আকাঙ্ক্ষা আরও বেশি।

'রূপান্তর' ঘটতে শুরু করেছে!

ছাত্র কল্যাণ সমিতি তাদের এ কর্মপ্রক্রিয়ায় গণশ্রবণকে যুক্ত করে ২০০৭-এ। গণশ্রবণের কারণে তাদের এ উদ্যোগ একের পর এক রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে। এটা সম্ভব হচ্ছে গণশ্রবণ গ্রামের সবাইকে আরও নিবিড়ভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হবার পথ সহজ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে ছাত্র কল্যাণ সমিতির সদস্যরা নিজেদের চিন্তা ও কাজের সমালোচনা করার এক শক্তিশালী অভ্যাস রপ্ত করতে শিখেছে। ২০০৭ সালেই প্রথম তারা তাদের নিজের কাজের মূল্যায়ন করে। যৌথভাবে আলোচনার মাধ্যমে তারা খুঁজে বের করে তাদের অগ্রগতি, শক্তি আর দুর্বলতা।

প্রধান শক্তি হিসেবে তারা চিহ্নিত করে প্রতিটি সদস্যের লক্ষ্যে অনড় থাকা। দ্বিতীয়ত, নতুন সদস্য সৃষ্টি করতে পারা, যারা এখন নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসছে। তৃতীয়ত, গ্রামের মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারা। নারী সদস্যরা এখন শুধু পড়াচ্ছেই না, কেবল ছাত্রীদের বাড়িতেই যাচ্ছে না, সংগঠনের হয়ে গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে এমন একটিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কখনও কখনও রাত পর্যন্ত কাজ করছে। আগে এটা কল্পনাও করা যেত না। চতুর্থত, স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে অর্থ আসতে শুরু করা। পঞ্চমত, সদস্যদের সাংগঠনিক মানসিকতার বিকাশ। সংগঠনের ভাঙা বেড়া তাদের কাছে কোন সমস্যা নয়। বরং তারা মনে করে, নিজের জিনিস নতুনই কি আর পুরনোই কি। আগলেই একজিও আছে... তাদের অর্থ দেবার ইচ্ছাও আছে, কিন্তু উঠতে পারেনি। স্থানীয় মানুষের সম্পৃক্ততা সদস্যদের এক্ষেত্রে শক্তি যুগিয়েছে।

দুর্বলতা চিহ্নিত হয় সদস্যদের ধীরগতি। নিজেরাই নিজেদের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। লক্ষ্যের সঙ্গে অগ্রগতির তুলনা করে তারা চিহ্নিত করে, তারা অনেক বেশি এগোতে পারতো। শেখার পড়ানোর হচ্ছে কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। নতুন যারা নেতৃত্ব দিতে আসছে তাদের আন্তরিকতার ঘাটতি না থাকলেও প্রথম দিকের সদস্যদের মতো তেজস্বিতা চোখে পড়ে না। নতুন সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত ঠিক পরিশোধের আগ্রহও চোখে পড়ে না।

আলোচনা করে তারা বের করে নতুনদের এই পাশ ঠিক দুর্বলতা নয়, তাদের জন্য সময়ের অভাব স্বাভাবিক। এটা পুরনোদেরই সমস্যা। তারা নতুনদের মনের গভীর বন্ধু খোঁজে নিতে পারেনি। সবাই বলছে, 'আমরা', 'এটা আমাদের উদ্যোগ' প্রভৃতি এবং সবাই আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলছে, তবুও মানসিকতাটাকে ঠিক ১০০ ভাগ নয়, যেন একটু ঘাটতি হয়ে গেছে। এই ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব পুরনোদেরই, তারাই এই মানসিকতা এই নেতৃত্ব নতুন সদস্যদের মধ্যে ট্রান্সফার করতে পারেনি, অতীতে যেমনটি নিজেদের মধ্যে। গ্রামবাসীও বলছে, ভাল উদ্যোগ, আমাদের ছেলেমেয়ের ভাল করছে, ইদানীং মেয়েদের নেতৃত্ব শুরু করেছে, গড়ে তুলতে সহযোগিতা করেছে। এ সব সমিতিতে নিজেদের অর্জিত আর সম্পদ কতটা ছাড়াও তারা কোন কারণে প্রতাবিত বা নির্যাতিত হচ্ছে কি না তা চিহ্নিত করে এবং তার প্রতিকার কিভাবে পেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করে সমবেতভাবে।

লাইলী বেগম কিভাবে এ পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন এর ব্যাখ্যা দেবার সময় ছাত্র কল্যাণ সমিতির নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম গড়ার কথার মতো মৌলিক বিষয়টি উঠে আসে। এসব শুনে ইতোমধ্যে বেশ কয়টি সংগঠন গড়ে তুলেছে তারাও বলেছে, 'আমরাও শিক্ষিত হতে চাই'। তারা ছাত্র কল্যাণ সমিতিকে অনুরোধ জানায়, যাতে করে তাদেরও নিরক্ষরমুক্ত করতে সহযোগিতা করা হয়। ছাত্র কল্যাণ সমিতি তাদের গ্রামে গিয়ে তাদের নিরক্ষরমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়নি। তবে তারা বলেছে, আমরা আপনাদের গ্রামের তরুণদের সংগঠিত করে দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি, যাতে করে স্থানীয়ভাবে এরাই বছরের উদ্যোগ গড়ে ওঠে। অন্য গ্রামে ছাত্র কল্যাণ সমিতির মতো সংগঠন গড়ে উঠেছে কিনা তা জানা যায়নি। তবে এটা জানা গেছে, ওসব সংগঠন নিরক্ষর নারী, যারা তাদের সন্তানদের অবশ্য পাশের বাড়ির সন্তানদের কাছে পড়াশোনা শেখা শুরু করেছে। এসব নারী জানিয়েছেন, লেখাপড়া তাদের জানতেই হবে কারণ সমিতির হিসাবে তাদের নিজেদেরই রাখতে হবে নাহয় আবার প্রতাবিত হতে হবে।

একটি কৌশলগত অনুষ্ঠান

ছাত্র কল্যাণ সমিতি প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গ্রামের এবং এলাকার বাইরের শত শত মানুষ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আয়োজকরা জানায়, এ অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করি একাধিক কারণে। এক, আমাদের সারা বছরের অগ্রগতি আর ভাবনা সকলের সামনে তুলে ধরি। আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার পর্যালোচনা করা হয় এ অনুষ্ঠানে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজের প্রশংসা ও সমালোচনা দুটো সম্পর্কেই জানতে পারি। দুই, পরের বছরের জন্য নতুন অর্থের সংস্থান করি। অনেকে এ অনুষ্ঠানেই ঘোষণা করে পরের বছর তিনি কি সহযোগিতা করবেন। তিন, এ অনুষ্ঠানে ছাত্র কল্যাণ সমিতির সদস্যরা বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়- আলোচনা, প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ। এতে তাদের যে নেতৃত্ব দেবার শক্তি তা একদিকে যেমন সবার সামনে তুলে ধরা হয়, অন্যদিকে তাদের মধ্যে অনেক সাহস ও অনুপ্রেরণা তৈরি হয় যা নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক দিক। চার, এখন সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় তা হলো গত বছর থেকে এই অনুষ্ঠানের সূচিতে নিরক্ষর নারীর নাম যুক্ত হতে শুরু করেছে। তাদের যে অংশগ্রহণ পুরো এলাকার অন্যান্য নারীর মধ্যে এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। পাঁচ, এই মিলনমেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই গ্রামে একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা এই গ্রামের এবং অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা ও বন্ধন বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর মধ্যে চাকরি বা ব্যবসাটি সূত্র যে যেখানেই থাক, তারা সবাই আসার চেষ্টা করেন। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের পুরো অর্থ আসে গ্রামবাসীর কাছ থেকে।

নাছিমার উপলব্ধি ও প্রতিবাদ

নাছিমা সেতাবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রী। নাছিমার বাবার ছিল, তার থেকে নির্যাতিত আর কেউ নেই। কারণ তাকে নবম শ্রেণীর পড়ার সময় থেকে বিয়ে দেবার জন্য পরিবার থেকে চাপ নেয়া হচ্ছে, সে তা প্রতিবাদের মুখে ঠেকিয়ে রেখেছে। বেহালার নারীদের ঘটনা সামনাসামনি দেখার পর নাছিমা হতভম্ব হয়ে বেরিয়ে বলে ওঠে, আরও আগে কেন আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো না। নাছিমা এই নারীদের জানায়, আমি আপনাদের কাছ থেকে যে কি শিক্ষা আজ নিয়ে গেলাম তা আপনারা জানেন না। এতে আমার জীবনটাই পাল্টে যাবে। ফিরে এসে নাছিমা তার অন্য বান্ধবীদের সংগঠিত করতে শুরু করে, বিশেষ করে যারা তার মতোই বিয়ের চাপের মুখে আছে। অন্যদের সে এই বলে সংগঠিত ও সোচ্চার করছে যে, আমরা শহরে থেকেও যা করতে পারছি না এতে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েও, অথচ বেহালার নিরক্ষর নারীরা আমাদের চেয়ে বেশি পরিবর্তন এনেছে তাদের জীবনে। এটা খুবই লজ্জার।

উল্লেখ্য, নাছিমার বাবা-মা মেয়ের এহেন প্রতিবাদের মুখে সতিকারের কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মেয়ে যতদূর পড়তে চায় পড়ুক, যেখানে পড়তে চায় পড়বে, তার বাবা সব ব্যয় বহন করবে, নাছিমার বাবা বলেছে, মেয়ের যখন এতে আগ্রহ পড়াশোনা করবে তাই করুক।

(লেখক : পরেশ, ইউএনডিপি বাংলাদেশ)
manikswapna@ yahoo.com

নারী ও প্রগতি, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮